

লাক্ষা চাষ প্রযুক্তি



বিস্তারিত তথ্য ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর
টেলিফোন: ০২-৯২৬৩৮৬০, ০২-৯২৯৪০৭৯, ই-মেইল: cs0.ento@bari.gov.bd
লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, কল্যাণপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, টেলিফোন: ০৭৮১-৫২২৬৩



কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

লক্ষা চাষ প্রযুক্তি

রচনা ও সম্পাদনায়

ড. দেবশীষ সরকার

ড. মোঃ মোখলেসুর রহমান

ড. সৈয়দ নূরুল আলম

প্রকাশনায়

কীটতত্ত্ব বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

লাক্ষা চাষ প্রযুক্তি

প্রথম সংস্করণ : ১০০০ কপি
প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিঃ

প্রকাশনায় : কীটতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

আর্থিক সহযোগিতায় :
এনএটিপি-এসপিজিআর-লাক্ষা প্রকল্প
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

প্রচ্ছদ : লাক্ষা পোকা, বরই গাছের ডালে লাক্ষার বৃদ্ধি
প্রক্রিয়াজাতকৃত লাক্ষা (চাঁচ ও টিকিয়া)

মুদ্রণে : সৌরভ মিডিয়া প্রোডাক্টস
৩৬, বীর উত্তম কে এম শফিউল্লাহ সড়ক
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ০১৭১৮৪১৯০০১
ই-মেইল: sowrovmp@gmail.com

মুখবন্ধ

লাক্ষা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা কর্তৃক নিঃসৃত রজন জাতীয় পদার্থ যার অনুপম গুণাগুণের কারণে বিভিন্ন কাজে পৃথিবীব্যাপী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই লাক্ষা বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্পজাত পণ্য। সমগ্র বাংলাদেশের আবহাওয়া লাক্ষা চাষের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও এর চাষ রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অথচ খুব ভাল লাক্ষা হয় এরকম অসংখ্য পোষক গাছ যেমন- বরই, কড়ই, বাবলা, পলাশ, খয়ের ইত্যাদি এদেশের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর কীটতত্ত্ব বিভাগ এবং লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ লাক্ষা চাষের উন্নয়নে বিভিন্নমুখী গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। লাক্ষার উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারণ এবং লাক্ষা চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর এনএটিপি এর অর্থায়নে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন- নীলফামারী, রংপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাজীপুর অঞ্চলে লাক্ষা গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর সাথে ঐ অঞ্চলের প্রান্তিক ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে লাক্ষা চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

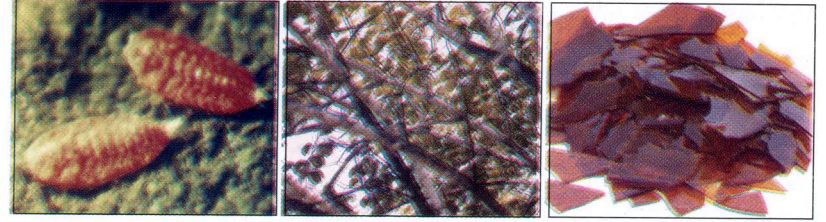
বাংলাদেশ একটি অতি জনবহুল দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, বাড়ছে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা। প্রান্তিক বা ভূমিহীন চাষী জমির আইলে বা বসতবাড়ীর আশে-পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন পোষক গাছে লাক্ষা চাষ করে উপার্জনক্ষম স্বচ্ছল ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারেন। যেহেতু লাক্ষাচাষ অত্যন্ত লাভজনক সেহেতু এর উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও উৎসাহদানের মাধ্যমে তাঁদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো খুব কঠিন কিছু নয়।

এদেশের সম্ভাবনাময় এলাকায় লাক্ষার চাষ সম্প্রসারণ ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে “লাক্ষা চাষ প্রযুক্তি” শীর্ষক পুস্তিকাটি লাক্ষা উৎপাদনে উৎসাহী সকলের অত্যন্ত উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

(ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল)
মহাপরিচালক

ভূমিকা

লাক্ষা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা, ক্যারিয়া ল্যাক্সা (*Kerria lacca*) কর্তৃক নিঃসৃত রজন জাতীয় পদার্থ। ইহা প্রাণীজাত বহুমুখী-কর্মশক্তি সম্পন্ন এক প্রকার রজন যার অনুপম গুণাগুণের কারণে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। লাক্ষা পোকাকার ত্বকের নীচে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এক প্রকার গ্রন্থি থেকে আঁঠালো রস নিঃসৃত হয়, যা ক্রমশঃ শক্ত ও পুরু হয়ে পোষক গাছের ডালকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। পোষক গাছের ডালের এই আবরণই 'লাক্ষা বা লাহা' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ডালের উক্ত শক্ত আবরণ ছাড়িয়ে ও শোধিত করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।



লাক্ষা পোকা

বরই গাছের ডালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লাক্ষা

লাক্ষা হতে তৈরী চাঁচ

পৌরাণিক যুগ হতেই বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশে লাক্ষা বহুবিধ কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে। মহাভারতের আদি পর্বে এর উল্লেখ রয়েছে, যেখানে কৌরবগণ পাণ্ডবদের ধ্বংস করার জন্য লাক্ষা দিয়ে 'জতু গৃহ' তৈরী করেছিল। ১৫৯০ খৃঃ সম্রাট আকবর লিখিত "আইন-ই-আকবরী" পুস্তিকায় লাক্ষার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মুসলিম সাধুপুরুষ ইমাম আবু হানিফার লিখিত পুস্তকেও লাক্ষার নানাবিধ ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

লাক্ষা চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে লাক্ষা চাষ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। সাধারণতঃ লাক্ষা চাষের জন্য পৃথক কোন জমির প্রয়োজন পড়ে না। লাক্ষার পোষক গাছসমূহ জমির আইল, বসতবাড়ীর আশেপাশে, খালের পাড়, রাস্তা ও রেল লাইনের পাশে পরিত্যক্ত স্থানসমূহে লাগানো যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বাৎসরিক প্রায় ১,২০০ (এক হাজার দুইশত) হেক্টর জমিতে লাক্ষার চাষ হয় এবং সেখান হতে মাত্র ১,০০০ (এক হাজার) মেট্রিক টনের মত ছাড়ানো লাক্ষা উৎপাদিত হয়। অথচ বাংলাদেশেরই বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) মেট্রিক টনের অধিক। এছাড়াও লাক্ষার বহুবিধ ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশেই লাক্ষা রপ্তানীর সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। বিশেষতঃ পশ্চিমা দেশসমূহের বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় ও কাঠের আসবাবপত্র বার্নিশের কাজে ব্যাপকভাবে লাক্ষার ব্যবহার হওয়ায় উক্ত দেশসমূহে একটি বড় ধরনের লাক্ষার বাজার রয়েছে। কেননা শীতপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে ঐ সকল দেশে লাক্ষা চাষ সম্ভবপর নয়।

মোটামুটিভাবে সমগ্র বাংলাদেশের আবহাওয়া লাক্ষা চাষের উপযোগী। এছাড়াও লাক্ষার অসংখ্য পোষক গাছ অযত্নে অবহেলায় যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উক্ত গাছগুলিকে লাক্ষা চাষের আওতায় এনে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা উৎপাদনই কেবল সম্ভবপর নয়, একই সাথে বিশাল কর্মহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানও করা সম্ভব। কেবলমাত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বর্তমানে লাক্ষার যে পোষক গাছ রয়েছে সেখান হতেই প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) টন ছাড়ানো লাক্ষা উৎপাদন করা সম্ভব, যা বর্তমান বাজার মূল্যে প্রায় ৪ (চার) কোটি টাকার মত এবং এর সাথে প্রায় ২০ হাজার ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষকের কর্মসংস্থান করাও সম্ভব।

নিম্নে বিভিন্ন পোষক গাছপ্রতি আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব প্রদান করা হলো :

পোষক গাছের নাম	লাক্ষা উৎপাদনে গাছপ্রতি খরচ (টাকা)	গাছপ্রতি ছাড়ানো লাক্ষা উৎপাদন (কেজি)	গাছপ্রতি আয় (টাকা)	নীট লাভ (টাকা)
বরই	৪৫০.০০	২০	১,৫০০.০০	১,০৫০.০০
শিরিষ	১,৪০০.০০	৮০	৬,০০০.০০	৪,৬০০.০০
পলাশ	৪০০.০০	১০	৭৫০.০০	৩৫০.০০
বাবলা	৪০০.০০	৮	৬০০.০০	২০০.০০
কুসুম	১,১০০.০০	২০	২,০০০.০০	৯০০.০০

সূত্র : লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, কল্যাণপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

আবাদী জমির মধ্যেও বরই জাতীয় পোষক গাছ লাগালে লাভজনকভাবে বিভিন্ন ফসল চাষ করা সম্ভব। বিভিন্ন ফসলের একক চাষের ফলে যে পরিমাণ লাভ পাওয়া যায় সে তুলনায় লাক্ষার সাথে সাথী ফসল হিসেবে উক্ত ফসলের চাষ করে তিন/চার গুণ লাভ পাওয়া যায়।



লাক্ষার সাথী ফসল		
গম	কচু	হলুদ

লাক্ষার সাথে আবাদকৃত কয়েকটি সাথী ফসলের নীট লাভের পরিমাণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

আন্তঃ ফসলের নাম	হেক্টর প্রতি নীট লাভ (টাকা)		
	লাক্ষা + আন্তঃ ফসল	লাক্ষা (একক ফসল)	অন্যান্য (একক ফসল)
লাক্ষা+রোপা আমন	৪৯,০০০.০০	৩১,৫০০.০০	১১,০০০.০০
লাক্ষা+গম	৬৪,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৭,০০০.০০
লাক্ষা+হলুদ	১,০৮,০০০.০০	৭৮,৫০০.০০	৪১,২০০.০০
লাক্ষা+কচু	১,২৪,০০০.০০	৮০,০০০.০০	৫৬,২০০.০০

সূত্র: লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, কল্যাণপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বিভিন্ন দেশে লাক্ষা চাষ

বর্তমান বিশ্বে ভারত একচেটিয়াভাবে লাক্ষার উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে রেখেছে। পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ লাক্ষাই ভারতে উৎপাদিত হয়। ভারতের পশ্চিম বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম প্রদেশই বেশীর ভাগ লাক্ষা উৎপাদন করে থাকে। ভারতের পরেই লাক্ষা উৎপাদনে থাইল্যান্ডের স্থান। লাক্ষার বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারে থাইল্যান্ড ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দী। এছাড়াও সমগ্র মিয়ানমার, দক্ষিণ চীন এবং পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে লাক্ষার চাষ হয়। তাইওয়ানের কিছু অঞ্চলে অল্প পরিসরে লাক্ষার চাষ হয়। লাক্ষার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাহিদা লক্ষ্য করে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ নতুনভাবে লাক্ষা উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে, যার মধ্যে ভিয়েতনাম অন্যতম।

লাক্ষার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যবহার

- কাঠের আসবাবপত্র বার্নিশ করা, বিভিন্ন ধরনের বার্নিশ, পেইন্ট ইত্যাদি তৈরী ও পিতল বার্নিশ করার কাজে;
- অস্ত্র কারখানায়, রেলওয়ে কারখানায়;
- বৈদ্যুতিক শিল্প কারখানায় অপরিবাহী বার্নিশ পদার্থ হিসেবে;
- বিভিন্ন অটোমোবাইল ইঞ্জিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে আঠালো, বন্ধনকারী পদার্থ হিসেবে।
- চামড়া রং করার কাজে;
- স্বর্ণালংকারের ফাঁপা অংশ পূরণে;
- লবণাক্ত পানি হতে জাহাজের তলদেশ রক্ষা করার কাজে বার্নিশ হিসেবে;
- লাক্ষার উপাদান, আইসো-এমব্রিটোলিডি পারফিউম শিল্পে ব্যবহৃত হয়;

- লাক্ষা হতে নির্গত উপাদান এ্যালুউরিটিক এসিড পারফিউম শিল্পে, পোকার যৌন আকর্ষণকরণ পদার্থ (Sex pheromone) তৈরীতে এবং অনেক ঔষধ প্রস্তুতের রাসায়নিক তৈরীতে ব্যবহৃত হয়;
- লাক্ষার আবরণযুক্ত কয়লা অত্যন্ত উঁচু স্থানসমূহে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়;
- ডাকঘরের চিঠি, পার্সেল ইত্যাদি সীলমোহর করার কাজে;
- পুতুল, খেলনা, আলতা, নখরঞ্জন, শুকনা-মাউন্টিং টিসু পেপার ইত্যাদি তৈরীর কাজে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়।

লাক্ষা পোকার জীবন বৃত্তান্ত

পূর্ণাঙ্গ একটি স্ত্রী পোকা তার কোষের মধ্যে প্রায় ৪০০টি ডিম পাড়ে। ৭-১০ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে খুব ছোট টকটকে লাল রং এর শিশু লাক্ষা কীট বা নিম্ফ ঝাঁক বেঁধে বের হয়ে আসে। সাধারণতঃ মৌসুম ও পোষক গাছ ভেদে নিম্ফ বের হতে ৮-২০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। তবে প্রথম ৪ দিনে সর্বোচ্চ পরিমাণ নিম্ফ বের হয়। পরবর্তীতে এই পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। প্রতিদিন সকাল ৮টা হতে ১২টা পর্যন্ত মাতৃকোষ হতে নিম্ফ বের হতে দেখা যায়। নিম্ফগুলি সাধারণতঃ লম্বায় ০.৬ মিঃ মিঃ এবং প্রস্থে ০.২৫ মিঃ মিঃ ও নৌকাকৃতির হয়। ঝাঁক বেঁধে বের হয়ে আসার পর থেকেই তারা পোষক গাছের নতুন কচি ডালের খোঁজ করতে থাকে। পছন্দসই ডাল পেলে শিশু কীটেরা ঝাঁক বেঁধে উক্ত ডালে স্থায়ী অবস্থান নেয় (প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার স্থানে ৪৪-১০৩টি)। নতুন ডালে অবস্থান নেয়ার পর নিম্ফগুলি তাদের চুলের মত লম্বা গুঁড় গাছের ফ্লোয়েমের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। পোষক ডালে স্থায়ী অবস্থান নেয়ার পর নিম্ফগুলি আর চলাচল করে না। অতঃপর ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাদের ভুকের নীচে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা (মুখমন্ডল, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার ছিদ্রপথ ও পায়ু ব্যতীত) একপ্রকার গ্রন্থি থেকে পাতলা উজ্জ্বল বর্ণের রস নিঃসরণ শুরু করে। ফলে প্রতিটি নিম্ফ ক্রমশঃ একটি কোষের আবরণের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে।

পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য লাক্ষা পোকা তিনবার খোলস বদলায়। প্রথমবার খোলস বদলানোর পর স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পোকায় তাদের পা, অ্যান্টিনা ও চোখ হারায়। পরবর্তীতে স্ত্রী পোকা আকারে স্থূলকায় হতে থাকে এবং তাদের বিভাজন রেখাসমূহ হারিয়ে যায়। ক্রমশঃ তারা একটি দোলাকৃতি বা গোলাকার ব্যাগের আকৃতি ধারণ করে কোষ অভ্যন্তরস্থ সকল স্থান দখল করে ফেলে। লাক্ষা পোকার ২য় ও ৩য় খোলস পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বেশ কম। তৃতীয় বা শেষবার খোলস পরিবর্তনের পর পুরুষ পোকায় অ্যান্টিনা, চোখ, ডানা, পা ইত্যাদি বের হয়। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা (ডালে প্রথম অবস্থান গ্রহণের ৬-১৬ সপ্তাহের মধ্যে বের হয়) কোষের পিছনের অংশে অবস্থিত কপাটক ঠেলে বের হয়ে আসে এবং স্ত্রী পোকার সাথে সংগমের পর মারা যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা ৬২-৯২ ঘন্টা পর্যন্ত বাঁচে এবং এসময় তারা প্রায় ৪৫টি স্ত্রী পোকাকে নিষিক্তকরণ করতে পারে। স্ত্রী লাক্ষা

পোকা ৩য় বা শেষবার খোলস বদলানোর পর পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। উক্ত সময় তারা পুরুষ পোকা দ্বারা নিষিক্তকৃত হয়। তবে সকল অবস্থাতেই স্ত্রী পোকা লাক্ষা নিঃসরণ করা চলমান রাখে। ফলশ্রুতিতে তাদের কোষের আকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে কারণে স্ত্রী পোকার কোষের আকার পুরুষ লাক্ষা কোষের আকার হতে বেশ কয়েকগুণ বড় এবং যা পরবর্তীতে ছাড়ানো লাক্ষার সবচেয়ে বড় উৎস হয়। পরবর্তীতে সময় আসলে স্ত্রী পোকা তাদের শরীর সঙ্কুচিত করে নিজ কোষের মধ্যে ডিম পাড়ে। শিশুকীট বা নিম্ফ ঝাঁক বেঁধে বের হবার ১-২ সপ্তাহের পূর্বেই পায়ুর কপাটক ছিদ্রের মুখে হলুদাভ কমলা রং-এর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, শিশু কীটের ঝাঁক বাঁধার সময় এসে যাচ্ছে।



বরই গাছের ডালে লাক্ষা পোকার নিম্ফ

কোষ হতে সদ্য বের হওয়া নিম্ফ

লাক্ষা উৎপাদনের কলাকৌশল

লাক্ষা চাষের উপযোগী আবহাওয়া: নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া লাক্ষা চাষের উপযোগী। যে সকল অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম (সর্বোচ্চ সহনশীল তাপমাত্রা ৪০° সেন্টিগ্রেড) ও শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা (সর্বনিম্ন সহনশীল তাপমাত্রা ৪° সেন্টিগ্রেড) এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সেন্টিমিটার থেকে ১২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়, সে সকল অঞ্চলে লাক্ষার চাষ ভাল হয়। গ্রীষ্মকালে যদি তাপমাত্রা ১৭° সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে ১৫° সেন্টিগ্রেড এর নীচে নেমে যায় তবে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়, যদিও লাক্ষা নিঃসরণ বন্ধ হয় না।

লাক্ষা কীটের পোষক গাছ: যে সকল প্রজাতির গাছে লাক্ষা ভাল জন্মায় সেগুলোকে লাক্ষার পোষক গাছ বলে। যদিও প্রায় ১০০ (একশত) প্রজাতির গাছে লাক্ষা জন্মাতে পারে তবুও মাত্র কিছু প্রজাতিতে লাক্ষাপোকা ভালভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশে বরই, শিরিষ, বট, পাকুড়, পলাশ, খয়ের, বাবলা, ডুমুর, অড়হড়, কুসুম প্রভৃতি গাছে লাক্ষা ভাল জন্মে।



বরই পলাশ খয়ের শিরিষ



বাবলা ডুমুর অড়হড় কুসুম

বিভিন্ন ধরনের লাক্ষা পোকা ও ফসল: দুই ধরনের লাক্ষা পোকা বিভিন্ন ধরনের লাক্ষা ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত। বরই, পলাশ, বাবলা ইত্যাদি পোষক গাছসমূহে যে সমস্ত পোকা লাক্ষা উৎপাদন করে তাদের রং লাল বলে তাদেরকে রঙ্গিনী পোকা বলে। অন্যদিকে আর এক ধরনের লাক্ষা কীট কেবলমাত্র কুসুম গাছে ভালভাবে বৃদ্ধিলাভ ও বংশ বিস্তার করতে পারে এবং যে লাক্ষা উৎপাদন করে তাদের রং হলদে বা কুসুমী বলে এরা কুসুমী পোকা নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর প্রত্যেক প্রকারের লাক্ষা পোকা দুইবার ফসল দিতে পারে। সুতরাং, বৎসরে মোট ৪ (চার) টি ফসল পাওয়া সম্ভব।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে কুসুমী পোকের অপরিপাকতার কারণে সাধারণতঃ রঙ্গিনী পোকা দ্বারা লাক্ষার চাষ করা হয়। যে মাসে লাক্ষা ফসল কাটা হয় সে মাসের নাম অনুসারেই ফসলের নামকরণ করা হয়ে থাকে। রঙ্গিনী পোকা থেকে বৎসরে দুইবার, বৈশাখ মাসে ও কার্তিক মাসে ছাড়ানো লাক্ষা পাওয়া যায়। বৈশাখী ফসল পেতে প্রায় ৮(আট) মাস সময় লাগে, অন্যদিকে মাত্র ৪(চার) মাসেই কার্তিকী ফসল পরিপক্বতা লাভ করে। মাটিতে রসের অভাব ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে বৈশাখী ফসলে বীজ লাক্ষা উৎপাদন একটি বড় সমস্যা।

নিম্নের তালিকায় ৪(চার)টি লাক্ষা ফসলের বিবরণ দেয়া হলো :

ফসলের নাম	বীজ লাক্ষা লাগানোর সময়	পুরুষ কীট বের হওয়ার সময়	ফসল সংগ্রহের সময়	শিশুকীটের ঝাঁক বেঁধে বের হওয়ার সময়
-----------	-------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------------

রঙ্গিনী পোকা

কার্তিকী ফসল	জুন-জুলাই (আষাঢ়)	আগস্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র)	অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক)	অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক)
বৈশাখী ফসল	অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক)	ফেব্রুয়ারী-মার্চ (ফাল্গুন)	এপ্রিল-মে (বৈশাখ)	জুন-জুলাই (আষাঢ়)

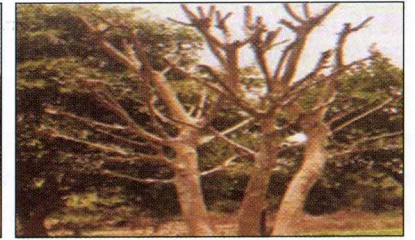
কুসুমী পোকা

অগ্রহণী ফসল	জুন-জুলাই (আষাঢ়)	সেপ্টেম্বর (ভাদ্র-আশ্বিন)	ডিসেঃ-জানুঃ (পৌষ)	ডিসেঃ-ফেব্রুঃ (মাঘ)
জ্যৈষ্ঠী ফসল	জানুঃ-ফেব্রুঃ (মাঘ)	মার্চ-এপ্রিল (চৈত্র)	জুন-জুলাই (আষাঢ়)	জুন-জুলাই (আষাঢ়)

পোষক গাছ ছাঁটাইকরণ: লাক্ষা কীটসমূহ কেবলমাত্র গাছের কচি ডগা বা ডাল হতে রস শোষণ করতে পারে। সে জন্য যে পোষক গাছে লাক্ষাকীট সংক্রমণ করা হবে তা আগেই ছাঁটাই করা উচিত। কার্তিকী ফসলের জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারি এবং বৈশাখী ফসলের জন্য মধ্য এপ্রিল গাছ ছাঁটাই-এর উপযুক্ত সময়।



বরই



পলাশ



বাবলা



কুসুম

শিশু কীট সংক্রমণ: লাক্ষার ভাল ফলন কীট সংক্রমণের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। সে কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে হবে :

- ১) যতদূর সম্ভব স্ব-সংক্রমণ এড়িয়ে চলা অত্যাৱশ্যক।
- ২) শত্রু কীটমুক্ত, পরিপক্ক ও স্বাস্থ্যকর বীজ লাক্ষা ব্যবহার করা উচিত।
- ৩) বীজ লাক্ষা গাছ হতে কাটার পর পরই সংক্রমণ করা উচিত।
- ৪) সংক্রমণের জন্য সঠিক পরিমাণ বীজ লাক্ষা ব্যবহার করতে হবে। সাধারণতঃ একটি স্বাস্থ্যকর ও পরিপক্ক বীজ লাক্ষার টুকরা নিজস্ব দৈর্ঘ্যের প্রায় ১৫-২০ গুণ পরিমাণ অধিক স্থান সংক্রমণ করতে পারে।
- ৫) বীজ লাক্ষা সমেত টুকরাটি এমনভাবে পোষক গাছের ডালে বাঁধতে হবে যেন সেটা গাছের ডালের সাথে বেশ ভালভাবে লেগে থাকে। বীজ লাক্ষার টুকরাগুলি কচি ডালের যত কাছাকাছি বাঁধা যায় ততই ভাল।
- ৬) বীজ লাক্ষা লাগানোর পর শিশু কীটগুলি পোষক গাছের কচি ডালের সমস্ত স্থানে বসে গেলে যত শীঘ্র সম্ভব বীজ লাক্ষার টুকরাগুলি সরিয়ে নেয়া উচিত।
- ৭) বীজ লাক্ষা গাছ হতে কাটার পর পরই যত শীঘ্র সম্ভব নতুন পোষক ডালে সংক্রমণ করা উচিত।



পোষক গাছের কচি ডালে লাক্ষা কীট সংক্রমণ



পোষক গাছের কচি ডালে লাক্ষার বৃদ্ধি

কূপ পদ্ধতিতে লাক্ষাচাষ: লাক্ষাকীট একটি শোষক জাতীয় পোকা এবং পোষক গাছ হতে রস চুষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং, চক্রাকারে লাক্ষা চাষের মাধ্যমে পোষক গাছকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দেয়া আবশ্যিক। কূপ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি এলাকার পোষক গাছসমূহকে তিন/চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ কোন একটি কূপের সকল গাছে পোকা সংক্রমণ করা হয়। যখন ফসল পরিপক্ক হয় তখন অন্য কূপের গাছসমূহকে সংক্রমিত করা হয়। এভাবে পূর্বোক্ত কূপটির গাছসমূহ নতুন পাতা ও ডগা বের হওয়ার যথেষ্ট সময় পায় এবং পূর্ণ প্রাণশক্তিও ফিরে পায়।

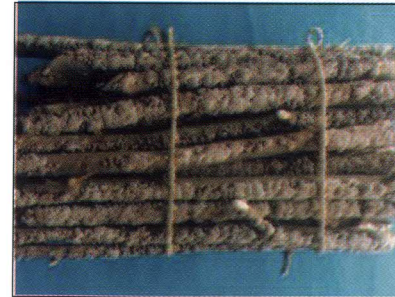
ফসল কাটা: লাক্ষা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পরই ফসল কাটা উচিত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে ফসল পরিপক্ক হওয়ার সঠিক সময় সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব।

- স্ত্রী কোষগুলোর ভিতরের পদার্থের দানাবদ্ধ ভাব। যদি একটি স্ত্রী কোষ দুটি আঙ্গুলের সাহায্যে পিষে দেয়া যায় তাহলে বৈশাখী ও কার্তিকী উভয় ফসলেই ৩-৪ সপ্তাহ পূর্ব হতেই ভিতরের পদার্থের একটি দানা দানা ভাব লক্ষ্য করা যায়।
- লাক্ষার আবরণে ফাটল ধরা : বৈশাখী ও কার্তিকী উভয় ফসল পরিপক্কতা লাভের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে লাক্ষার আবরণে একটা ফাটা দাগ লক্ষ্য করা যায়।
- লাক্ষা ফসলের আবরণের শুষ্ককৃতি ভাব : শিশু কীটের ঝাঁক বেঁধে বের হওয়ার প্রায় ২ সপ্তাহ পূর্ব হতেই লাক্ষার আবরণ শুষ্ক হয়েছে বলে মনে হয়।
- স্ত্রী কোষের পিছনের অংশ হলুদবর্ণ ধারণ : স্ত্রী কোষের পিছনের দিকে ৩টা ছিদ্র থাকে। একেবারে নীচের দিকের ২টি শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার এবং অন্যটি একটু উঁচুতে। উক্ত ছিদ্রটি হতে একগুচ্ছ সাদা আঁশ বের হতে দেখা যায়। ঐ ছিদ্রের নিকট কোষের রং কমলা রং হয়ে থাকে। কিন্তু শিশুকীট বের হওয়ার পূর্বে উক্ত কমলা রং পরিবর্তিত হয়ে হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে।

সাধারণতঃ লাক্ষা ফসল দু'ভাবে উত্তোলন করা যায়। যদি সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তা কাটা হয় অর্থাৎ ঝাঁক বেঁধে শিশুকীট বের হওয়ার পূর্বেই কাটা হয়ে থাকে এবং তাতে জীবন্ত কীট থাকে তখন তাকে বলা হয় “আরি”। অন্যদিকে শিশুকীট বের হয়ে যাবার পর তা কাটা হলে অর্থাৎ যাতে কেবলমাত্র মৃত পোকাই থাকে তখন ঐ লাক্ষাকে “ফুংকী” বলে। লাক্ষা ফসল যদি “আরি” অবস্থায় কাটা হয়, তা হলে তাতে জমাট বাঁধার সম্ভাবনা “ফুংকী” লাক্ষা অপেক্ষা বেশী থাকে। লাক্ষা ফসল “আরি” হিসাবে সংগ্রহ করলে বীজ লাক্ষার অপ্রতুলতা দেখা দেয়।

পোষক গাছের ডাল হতে পরিপক্ক লাক্ষা দা বা কাঁচির সাহায্যে ছাড়ানো হয় যা “ছাড়ানো লাক্ষা” নামে পরিচিত। ছাড়ানো লাক্ষা ভালভাবে রোদে শুকিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে গুদামজাত করা বা প্রক্রিয়াজাতকরণ করা উচিত।

লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপসমূহ



(১) ছাড়ানোর জন্য প্রস্তুতকৃত লাক্ষার তুড়ি



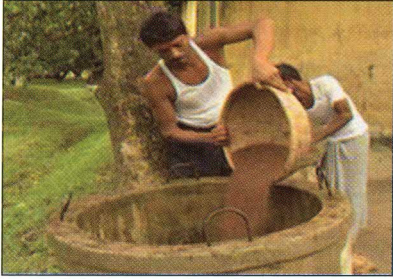
(২) পোষক ডাল হতে লাক্ষা ছাড়ানো



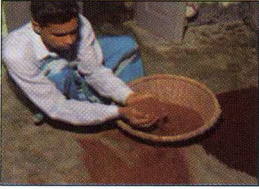
(৩) ছাড়ানো লাক্ষা চূর্ণকরণ



(৪) চালনী দ্বারা চলে চূর্ণ লাক্ষা পরিস্কার করা



(৫) পরিস্কার করা চূর্ণ লাক্ষা ধৌতকরণ



(৬) ধৌতকরণের পর ভেজা লাক্ষা বাতাসে শুকানো



(৭) বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে সাধারণ চুল্লীতে টিকিয়া/চাঁচ তৈরী করা



লাক্ষা চাষের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও তাদের প্রতিকার

লাক্ষা ফসলের ক্ষতি প্রধানতঃ দু' কারণে হয়ে থাকে :

- ১। লাক্ষা পোকার শত্রুকীটজনিত ক্ষতি এবং
- ২। অন্যান্য কারণে ক্ষতি।

১। লাক্ষা পোকার শত্রুকীটজনিত ক্ষতি: শত্রুকীটের কারণে লাক্ষা কোষের শতকরা ৩০-৪০ ভাগ নষ্ট হয়। অর্থাৎ মোট ফসলের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ শত্রুকীটজনিত ক্ষতির কারণে নষ্ট হতে পারে। শত্রুকীটগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) পরজীবী পোকা (Parasites) এবং

(খ) পরভোজী পোকা (Predators)

(ক) **পরজীবী পোকা:** এরা লাক্ষার যে কোষের মধ্যে জন্মে সেখানেই লাক্ষা কীটগুলিকে নষ্ট করে, কিন্তু লাক্ষার আবরণ নষ্ট করে না। এ যাবৎ মোট আট প্রকারের পরজীবী পোকার সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ মাত্র ৫-১০%, যা অগ্রাহ্য করা চলে।

(খ) **পরভোজী পোকা:** পরভোজী পোকাসমূহের মধ্যে দুটি পোকা, সাদা প্রজাপতি (*Eublemma amabilis* Moore) এবং কালো প্রজাপতি (*Pseudohypatopa pulverea* Meyric) লাক্ষা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। এরা লাক্ষা কোষের উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শুককীট বের হয়ে লাক্ষা পোকা খাওয়া শুরু করে। এরা শুধুমাত্র একটি কোষেই আবদ্ধ থাকে না, একটির পর একটি কোষের মধ্যে প্রবেশ করে লাক্ষাকীট খেয়ে ফেলে এবং লাক্ষার আবরণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। ক্রমে শুককীট হতে মুককীট ও পূর্ণাঙ্গ পোকায় রূপান্তরিত হয়ে পুনরায় নতুন জীবনচক্র শুরু করে। এভাবেই ক্রমাগত এরা লাক্ষা ফসলের ক্ষতি করে থাকে এবং শতকরা প্রায় ৩০-৪০% ভাগ ফসল নষ্ট করে ফেলে।



সাদা প্রজাপতির কীড়া দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির নমুনা



কালো প্রজাপতির কীড়া দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির নমুনা



সাদা প্রজাপতির পুতুলি



কালো প্রজাপতির পুতুলি



পূর্ণাঙ্গ সাদা প্রজাপতি



পূর্ণাঙ্গ কালো প্রজাপতি

উভয় প্রকার শত্রুকীটের জীবন চক্র প্রায় একই রকমের। *Eublemma amabilis*-এর পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে সাদা প্রজাপতির মত। এদের আক্রমণ হলে লাক্ষার কোষগুলি ফোলা ফোলা মনে হয় এবং পোকা বের হওয়ার ছিদ্র দেখা যায়। আক্রান্ত স্থান ভাঙলে সাদা রং-এর শুককীট বা গাঢ় বাগামী রং-এর মূককীট দেখা যায়। *Pseudohypatopa pulverea* -এর পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে গাঢ় ধূসর বর্ণের। এদের শুককীটগুলো কিছুটা কালচে রং-এর। এরা আঁকাবাঁকা নালা তৈরী করে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে এবং সাদা সিল্ক সূতা দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখে। এদের মূককীট তুলনামূলকভাবে ছোট ও কালচে রং-এর। উল্লেখিত দুই প্রজাতির শত্রুকীটই কার্তিকী ফসলে বেশী ও বৈশাখী ফসলে তুলনামূলক কম ক্ষতি করে। সাদা প্রজাপতি গাছে থাকা অবস্থায় লাক্ষা ফসলের অধিক ক্ষতি করে, অন্যদিকে কালো প্রজাপতি লাক্ষা ফসল গুদামে মজুদ থাকা অবস্থায় বেশী ক্ষতি করে থাকে। কার্তিকী ফসলে, শিশুকীট পোষক গাছের কচি ডালে সম্পূর্ণরূপে অবস্থান নেয়ার প্রায় ১ মাস পর হতেই (মধ্য আগস্ট হতে সেপ্টেম্বর) উক্ত পরভোজী পোকা দুটির উপস্থিতি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। মধ্য আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সাদা প্রজাপতি এবং সেপ্টেম্বরের ২য় সপ্তাহ হতে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত কালো প্রজাপতির উপস্থিতি বেশী দেখা যায়।

পরভোজী পোকা শুধুমাত্র লাক্ষা ফসল উৎপাদনেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, বরং এদের শুককীট, মূককীট ও মলের উপস্থিতিতে দানালাক্ষার পরিমাণও কমে যায়। ফলে প্রক্রিয়াজাতকরণ খরচ বেশী পড়ে।

প্রতিকার

- বীজলাক্ষা লাগাবার সময় কেবলমাত্র পুষ্ট ও শত্রুকীট আক্রান্ত নয় এরূপ লাক্ষাবীজই ব্যবহার করা উচিত।
- শিশু লাক্ষাকীট বের হতে শুরু হলে সাধারণতঃ ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অধিকাংশ কীট বের হয়ে যায়। সুতরাং, এ সময়ের পর দ্রুত বীজলাক্ষার ডালগুলিকে গাছ হতে নামিয়ে ফেলতে হবে। শিশুকীটবিহীন বীজলাক্ষার লাক্ষাসমেত ডালগুলিকে গরম পানির মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে পরভোজী ও পরজীবি পোকাকার ডিম, শুককীট মরে যায়। ফলে পরবর্তীতে ফসলে লাক্ষার শত্রুকীটের সংক্রমণ হার কমে যায়।
- লাক্ষা কাটার পর পোষক গাছের নিকটবর্তী কোন স্থানে তা মজুদ করে রাখা সমীচীন নয়। কারণ, ক্রমাগত পূর্ণাঙ্গ শত্রুকীটগুলো বের হয়ে নিকটবর্তী গাছের নতুন লাক্ষা ফসলকে নষ্ট করে।
- মাঠে লাক্ষা ফসলে প্রথম উভয় শত্রুকীটের কীড়ার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলে নিম্ন বীজের নির্যাস (neem seed kernel extract) প্রতি লিটার পানিতে ১০.০ গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে ১ম বার এবং এর ১ (এক) মাস পর ২য় বার স্প্রে করে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

- ছাড়ানো লাক্ষা বেশীদিন মজুদ করে রাখলে কালো প্রজাপতির শত্রুকীটের সংক্রমণ হার বেড়ে যায়। সুতরাং, সংগৃহীত ফসল অতি দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ করলে একদিকে যেমন উন্নতমানের পাত লাক্ষা পাওয়া যাবে, অন্যদিকে পরবর্তী ফসলে উল্লেখিত শত্রুকীটের আক্রমণ হার কমে যাবে।
- প্রতি ৫.০ কেজি ছাড়ানো লাক্ষার সাথে এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেটের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ভালভাবে মিশিয়ে মোটা পলিথিন ব্যাগে গুদামজাত করে ৪(চার) মাস পর্যন্ত কালো প্রজাপতি নামক শত্রুকীট ব্যবস্থাপনায় ভাল ফল পাওয়া গেছে।

বন্ধুকীটের সাহায্যে শত্রুকীটের বিনাশ: লাক্ষা কীটকে যেমন সাদা ও কালো প্রজাপতির কীড়া মেরে ফেলে সরুপ ঐ শত্রুকীটকে নষ্ট করে এরূপ বন্ধুকীটও পাওয়া যায়। হাইমেনোপটেরা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ব্রাকোনিডি, ইকনিওমোনিডি, চ্যালসিডিডি গোত্রের বেশ কয়েকটি পরজীবি পোকা উক্ত শত্রুকীটসমূহের বিনাশ সাধন করতে পারে, যদিও এদেশে ঐ পদ্ধতির প্রচলন মাঠ পর্যায়ে এখনও সম্ভবপর হয়নি।

লাক্ষার সাথে অবস্থানরত অন্যান্য কীট: লাক্ষার শত্রুকীট ছাড়াও অন্যান্য নানা প্রকার কীটও লাক্ষার নিকটবর্তী স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কালো পিঁপড়া অন্যতম। তবে, সাধারণতঃ এরা লাক্ষার ক্ষতি করে না। বরঞ্চ অনেক সময় শত্রুকীটের শুককীট, মূককীটগুলিকে মেরে ফেলে। সুতরাং, এদেরকে মিত্রকীটও বলা চলে। তাছাড়া এরা লাক্ষা পোকা কর্তৃক নিঃসৃত বিন্দু বিন্দু মধুরস (Honey dew) খেয়ে থাকে। এতে লাক্ষা কীটের উপকারই হয়। কারণ, এই মধুরস খেয়ে না ফেললে অনেক সময় ধূলাবালির সাথে মিশে লাক্ষা কীটের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গর্তগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, লাক্ষাকীট মারা যেতে পারে। এক শ্রেণীর পিঁপড়া আছে যারা লাক্ষাকীটের ঝাঁক বাঁধার সময়ে কিছু ক্ষতি করে থাকে। কারণ, এরা শিশু লাক্ষাকীটগুলিকে নষ্ট করে। তবে, যে পরিমাণ ক্ষতি তারা করে তা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। যাহোক, যদি এর প্রতিবিধান প্রয়োজন হয় তবে নিম্নের ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে :

- যে গাছে পিঁপড়া দেখা যায় সে গাছের গোড়ায় চারদিকে আঁঠা লাগিয়ে দিলে পিঁপড়া গাছে উঠতে পারবে না।
- আখের গুড় বা অন্য কোন মিষ্টি জাতীয় পদার্থ মাটির উপর গাছের গোড়ায় ছিঁটিয়ে দিলে পিঁপড়াগুলি লাক্ষাকীট রেখে এগুলি খেতে আসে।
- পিঁপড়ার বাসা খুঁজে সেখানে গরম পানি অথবা ডারসবান ২০ ইসি নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৫.০ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে ঢেলে দিলে এরা মরে যাবে।

২। অন্যান্য কারণে ক্ষতি: এ কারণে ক্ষতির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। অর্থাৎ যত শিশু লাক্ষাকীট প্রথমতঃ বের হয়ে আসে তার প্রায় ৩০-৪০% মরে যায় এ কারণে। এ ক্ষতির মধ্যে আবহাওয়াগত সমস্যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জুলাই মাসে যখন গাছে লাক্ষার বীজ বাঁধা হয় তখন জোরে হাওয়া এবং বৃষ্টিপাত হলে প্রচুর পরিমাণে শিশুকীট গাছ থেকে ধুয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অবিরামভাবে কয়েকদিন বৃষ্টি হলে ঘরে রাখা বীজগুলোও নষ্ট হয়ে যায়। বৈশাখী ফসলের ক্ষেত্রে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের অত্যধিক শীত এবং এপ্রিল-মে মাসের অত্যধিক গরম লাক্ষা পোকের ক্ষতি করে থাকে। লাক্ষা পোকের ডিমপাড়া এবং শিশুপোকা বের হওয়ার উপরও তাপপাত্রা এবং আর্দ্রতার যথেষ্ট প্রভাব আছে। সময়মত গাছ ছাঁটাই না করা এবং বীজলাক্ষা পোষক ডালে বাঁধার ভুলেও বহু লাক্ষাকীট নষ্ট হয়।

প্রতিকার: আবহাওয়াগত সমস্যা প্রতিকারের কোন উপায় নেই। তবে অত্যধিক গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় গাছের গোড়ায় ও লাক্ষাসমেত পোষক ডালে পানি সিঞ্চন করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।